বাঙালি রমণীর পাকিস্তানি সৈন্যপ্রীতি

মুনতাসীর মামুন

বহুদিন পর ১৯৭১ সালের ঘাতক বা যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে বাংলাদেশের মানুষ সোচ্চার হয়ে উঠেছে। সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ের মানুষের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রথমবার সব ধরনের (এদের অনেকে যে আগে এ দাবি করেননি তা নয়) রাজনৈতিক দলও একই দাবি তুলছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারপ্রধান, সেনাপ্রধান ও প্রধান নির্বাচন কমিশনারও এর যৌক্তিকতা প্রকারান্তরে স্বীকার করেছেন। সিভিল সমাজ থেকে যেসব দাবি উঠেছে তার সারাংশ হলো−

১. যুদ্ধাপরাধীদের স্পেশাল ট্রাইব্যুনালে বিচার করতে হবে এবং বাদী হবে সরকার/রাষ্ট্র;
২. ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল/রাজনীতি নিষিদ্ধ করতে হবে;
৩. যুদ্ধাপরাধীরা নির্বাচন করতে পারবে না। বিদ্যমান আইন ও সংবিধানের আলোকেই তা করা যেতে পারে। সরকারের একটি অংশ যার নেতৃত্বে আইন উপদেষ্টা ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন, এটি মানতে নারাজ। তিনি পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন, সরকারের হাতে অনেক কাজ। সুতরাং বাড়তি এসব দায়িত্ব সরকার নিতে পারবে না। অন্যদিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারপ্রধান কয়েকদিন আগে বলেছিলেন, কেউ সংক্ষুব্ধ হলে আদালতে যেতে পারে। হয়তো এতে উৎসাহিত হয়ে একজন মুক্তিযোদ্ধা ১৯৭১ সালের আলবদর, মুজাহিদ ও কাদের মোল্লা এবং শাহ হান্নান নামে সাবেক এক সচিবের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা করেছেন। ওই ৩ জন মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে অশালীন মন্তব্য করেছিলেন। আদালত তা তদন্তের জন্য থানায় প্রেরণ করেন। কিন্তু সরকার অনুমতি না দেওয়ায় পুলিশ তা আদালতে ফেরত পাঠায়। ব্যারিস্টার মইনুল বলেছেন, ব্যক্তি রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা করতে পারে না। তাহলে প্রশ্ন, মাত্র কয়েকদিন আগে এক ব্যক্তি ড. কামাল হোসেনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা করলেন কীভাবে? এসব আশঙ্কা করেই আমরা দাবি করছি যুদ্ধাপরাধীদের বিরুদ্ধে মামলা সরকারকেই করতে হবে। তবে এ ঘটনা প্রমাণ করে, ড. ফখরুদ্দীন আহমদকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার হিসেবে যতটা শক্তিশালী মনে হয় আসলে ততটা শক্তিশালী তিনি নন। আরো যুক্তি আছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও জরুরি আইনের বিধান ৩ মাসের জন্য। সরকারের প্রধান কাজ নির্বাচন করা। হাট-বাজার ভাঙা, উপজেলা নির্বাচন দেওয়া, দুই নেত্রীকে গ্রেফতার করা, শিক্ষকদের গ্রেফতার করার কাজগুলো কে চাপালো তাদের কাঁধে? তারা বাড়তি কাজ হাতে নিয়েছেন দেখেই 'বাড়তি' দাবি তোলা হয়েছে। কর ফাঁকির জন্য গ্রেফতার করে ৭ থেকে ১০ বছর কারাদণ্ড দেওয়া যাবে আর ঘাতকদের কিছু করা যাবে না? এটা কি খুব হালকা এবং অদ্ভুত যুক্তি হয়ে গেল না? মইনুল হোসেন আরো বলেছেন, ৩৬ বছর যারা বিচার করেনি, তাদের বলুন। ব্যারিস্টার মইনুল ৩৬ বছর আগে সরকারি দলের এমপি ছিলেন দেখেই তো তার কথামতো তার কাছেই দাবি তোলা হচ্ছে।

ওই একই ধারায় জামায়াত নেতা ও সমর্থকরা বেশকিছু মন্তব্য করেছেন−

১. ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ হয়নি, হয়েছিল গৃহযুদ্ধ।
২. সুন্দরী নারীর জন্য যুদ্ধ হয়েছিল
৩. ভারতের স্বার্থরক্ষায় যুদ্ধ হয়েছিল।
৪. মুক্তিযোদ্ধাদেরও বিচার করতে হবে।

জামায়াত দেশে স্টাবলিশমেন্টের সমর্থন পাচ্ছে। বিদেশেও কেউ কেউ একই রকম কথাবার্তা বলছেন। অনেকে বলতেন, পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা ১৯৭১ সালের পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে এসব কর্মকাণ্ডের সমন্বয় ঘটাচ্ছে। এসব কথা আগে বিশ্বাস করতাম না। কিন্তু সাম্প্রতিক বিভিন্ন ঘটনায় সে বিশ্বাস শিথিল হয়ে গেছে।

বিদেশে প্রচারের ধরনটা অন্যরকম। জামায়াত বা জামায়াত সমর্থকদের মতো স্থূল নয়। পাকিস্তানি নীতিনির্ধারকরা ১৯৭১ সালের গণহত্যা খাটো করে দেখার জন্য যে ধরনের প্রচার করছে, বিদেশি 'অ্যাকাডেমিশিয়ান'দের কেউ কেউ সে কৌশল নিয়েছেন। কৌশলটা এ রকম− কিছু হত্যা হয়েছিল, যুদ্ধ হলে অমনটি হয়, তবে গণহত্যা হয়নি। ধর্ষণ যুদ্ধ এক-আধটু হয়, সেটি ধর্তব্যের মধ্যে নয়, তবে যে ২-৪ লাখ ধর্ষণের কথা বলা হয় তা 'ফ্যান্টাসটিক'। এর সাম্প্রতিক উদাহরণ গবেষক শর্মিলা বসুর কিছু লেখালেখি।

লন্ডন থেকে আমার এক তরুণ সহকর্মী জানান, পাকিস্তানিরা বিজয় দিবস উপলক্ষে শর্মিলা বসুকে নিয়ে এসেছে আলোচনার জন্য। কী করা? আমি বললাম, অনেকে খবর হওয়ার জন্য এগুলো করে। আগে এসব উপেক্ষা করতাম। এখন দেখছি, উপেক্ষা করলে তাদের মিথ্যাচার সত্যে পরিণত হয়ে যায়− যেভাবে জেনারেল জিয়া স্বাধীনতার ঘোষক হয়ে গেলেন। তাকে পরামর্শ

দিয়েছি, নিয়মতান্ত্রিকভাবে এসব মিত্যাচারের প্রতিবাদ করতে হবে, যেভাবে আমরা করছি বাংলাদেশে। প্রয়োজন হলে, এসব যারা বলে ও পৃষ্ঠপোষকতা করে তাদেরও ত্যাগ করতে হবে সামাজিকভাবে।

শর্মিলা বসুর প্রবন্ধ আগে দেখিনি। এখন কৌতূহল হলো। ইন্টারনেট থেকে তা সংগ্রহ করলাম। এটি ছাপা হয়েছিল মুম্বাইয়ের বিখ্যাত পত্রিকা ইপিডব্লিউতে। প্রবন্ধটি পড়ে মনে হলো, সম্পাদক এটি ছাপলেন কীভাবে? এটি শুধু মিথ্যাচারই নয়, পুরো একটি জাতিকে আঘাত করা। ইপিডব্লিউর প্রতিষ্ঠাতা শচিন চৌধুরী বেঁচে থাকলে এ অনাচার সম্ভব হতো না। আগেই বলেছি, আগে এসব লেখালেখি উপেক্ষা করতাম। কিন্তু এখন করা যাবে না, কারণ এ প্রবন্ধ পুরো একটি জাতির বিরুদ্ধে। গবেষকরা কোনো প্রবন্ধ পড়ার আগে উৎস দেখেন। শর্মিলার প্রবন্ধের ধরনটা অ্যাকাডেমিক। তাই উৎস দেখলাম (এখানে বলে রাখা ভালো, উৎসের দৈর্ঘ্যের ওপর প্রবন্ধের মান নির্ভর করে না)। তার প্রবন্ধের নাম বেশ দীর্ঘ, ১৪টি শব্দের শিরোনাম। আজকাল পাশ্চাত্যে এ ধরনের একটি ফ্যাশন হয়েছে, এক্সোটিক সব শিরোনাম ব্যবহার করা। শিরোনাম দিয়ে একটি অ্যাকাডেমিক ভাব আনা। শর্মিলা বসুর প্রবন্ধের নাম– 'লুজিং দ্য ভিকিটম : প্রবলেমস অব ইউজিং উইম্যান অ্যাজ উইপনস ইন রিকাউন্টিং দ্য বাংলাদেশ ওয়ার'। উৎসের মধ্যে আছে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রের ৮ম খণ্ড, শাহরিয়ার কবির সম্পাদিত একটি সংকলন, শর্মিলার নিজের একটি প্রবন্ধ, যুক্তরাষ্ট্রের একজন গবেষকের একটি বই। লন্ডনের জামায়াতভিত্তিক প্রকাশনার একটি বই আর পাকিস্তানের ৩টি। এর মধ্যে আছে পাকিস্তান সরকার কর্তৃক ১৯৭১ সালের প্রকাশিত শ্বেতপত্র ও পরাজিত পাকিস্তানি জেনারেল মৃধা ও নিয়াজি, তার নেওয়া পাকিস্তানি কিছু সেনা অফিসারের সাক্ষাৎকার অন্যতম। অর্থাৎ তিনি বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন পাকিস্তানি সূত্রের ওপর। এসব সূত্র তার কাছে বেশি গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছে। এ উৎস বিশ্লেষণ করলে শর্মিলার উদ্দেশ্য পরিষ্কার হয়ে যায়।

১. শর্মিলার প্রবন্ধের মূল ফোকাস ১৯৭১ সালের ধর্ষিতা নারী। তার বক্তব্য, বাংলাদেশের লেখক, গবেষক ও তাদের সমর্থক বিদেশি গবেষক লেখকদের মতে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ধর্ষিতা নারীর সংখ্যা ২ থেকে ৪ লাখ কিন্তু শর্মিলার (ও পাকিস্তানিদের) মতে, আসলে সংখ্যা কয়েক হাজার যার, মধ্যে বাঙালি কর্তৃক ধর্ষিত বিহারি নারীও আছে। অর্থাৎ ধর্ষিত বাঙালি নারীর সংখ্যা আরো কম।

এবং এগুলো যুদ্ধজাত নয়। তার ভাষায়-
৺এঞযব ধাধরষধনষব বারফবহপব পড়হভরৎসং ঃযব ড়পপঁৎৎবহপব ড়ভ ৎধঢ়ব নঁঃ ফড়বং হড়ঃ ংঁঢ়ঢ়ড়ৎঃ পষধরসং ড়ভ যঁহফৎবফং ড়ভ ঃযড়ঁংধহফং ড়ভ ড়িসবহ ৎধঢ়বফ নু ঃযব ধৎসু রহ ঊধংঃ চধশরংঃধহ রহ ১৯৭১. এঞযব ংবাবহ পধংব ংঃঁফরবং রহ ঘববষরসধ ওনৎধযরস্তং নড়ড়শ, ঃযব ড়ঢ়ঢ়ড়ৎঃঁহরংঃরপ ৎধঢ়বফ ধফসরঃঃবফ নু ঃযব ধৎসু ধহফ ঃযব ৎবঢ়ড়ৎঃং ড়ভ সধংংধপৎবং ড়ভ হড়হ ইবহমধষর (বিংঃ চধশরংঃধহর ধহফ ইরযধৎর) সবহ, ড়িসবহ ধহফ পযরষফৎবহ নু ইবহমধষরং, ংঁমমবংঃ ঃযধঃ ংবাবৎধষ ঃযড়ঁংধহফ ড়িসবহ সধু যধাব নববহ ারপঃরসং ড়ভ ংবীঁধষ ারড়ষবহপব রহ ১৯৭১.

২। বাংলাদেশের লেখালেখিতে যে সব ধর্ষণের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, সেগুলো অবাস্তব ও অতিরঞ্জিত। উদাহরণ হিসেবে তিনি রাবেয়া, ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণী ও চম্পা নামে একটি মেয়ের কথা উল্লেখ করেছেন। এদের ভাষ্য মিথ্যা এবং প্রিয়ভাষিণী তো স্বেচ্ছায় থেকে গেছেন ধর্ষিত হওয়ার জন্য [কারণ, তিনি পালাননি]।

৩. পরিকল্পিত ধর্ষণের কোনো নীতি পাকিস্তানি সৈন্যরা গ্রহণ করেনি। ধর্ষণ কিছু হয়েছে তবে সেগুলোর সঙ্গে সবাই জড়িত-পাকিস্তানি সৈন্য, বাঙালি, বিহারি সব এবং এগুলো হচ্ছে 'ঙঢ়ঢ়ড়ৎঃঁহরংঃরপ ংবীঁধষ পৎরসবং রহ ঃরসবং ড়ভ ধিৎ। কারণ, পাকিস্তানি সৈন্যরা তো ভদ্র, পেশাদার।

৪. বাঙালিরা বিহারিদের হত্যা করে এথনিক ক্লিনজিং চালিয়েছিল।

শর্মিলা লিখেছেন, ধর্ষণের বিষয়টি রাজনৈতিক বাগাড়ম্বর। কত ধর্ষণ হয়েছে সে সম্পর্কে কোনো তথ্য প্রমাণ নেই। অনেকে চিৎকার করে এসব কথা বলে 'শত্রু'কে নিন্দিত করতে চায়। উদ্দেশ্য, 'ভিকটিম হুড'কে মহিয়ান করা আদর্শের খাতিরে এবং ক্ষতিগ্রস্ত [অর্থাৎ ধর্ষিত] যারা তাদের প্রতি কোনো 'কনসার্ন' নেই [অর্থাৎ আসল ক্ষতিগ্রস্তরা এতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন]। সত্যি বলতে কি, গত ২৬ বছরে এ ধরনের প্রবন্ধ এই প্রথম পড়লাম। পাকিস্তানিরাও এভাবে নিজেদের পক্ষাবলম্বন করেনি। ১৯৭১ সালের ৩৬ জন পাকিস্তানি নীতি-নির্ধারকের সঙ্গে আমি কথা বলেছি [উদাহরণ 'সেই সব পাকিস্তানি' ও 'পরাজিত পাকিস্তানি জেনারেলদের চোখে মুক্তিযুদ্ধ']। তারা গণহত্যা-ধর্ষণকে নানাভাবে এড়িয়ে যেতে চেয়েছেন কিন্তু এ ভাষায় লেখেননি

বরং ছিলেন অ্যাপলোজেটিক।

শর্মিলার বিবরণের কিছু নমুনাও উল্লেখ করতে হয়। আগাগোড়া মুক্তিযুদ্ধকে তিনি বলেছেন 'গৃহযুদ্ধ'। লিখেছেন, গৃহযুদ্ধের সময় পূর্ব পাকিস্তানে লোকসংখ্যা ছিল ৭.৫ কোটির মতো। যুদ্ধের শুরুতে পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তানি সৈন্য সংখ্যা ছিল ২০ হাজার। ডিসেম্বরে এ সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৪ হাজারে। সশস্ত্র সিভিল পুলিশ ও অসৈন্যের সংখ্যা ছিল ১১ হাজার। সুতরাং ৩৪ হাজার সৈন্যের পক্ষে একটি দেশ পরিচালনা করে যুদ্ধ করে এত ধর্ষণ করা সম্ভব নয়। তার মতে, হামুদুর রহমান কমিশনারের প্রধান একজন বাঙালি বিচারপতিও তা স্বীকার করেছেন।

শর্মিলা বাংলাদেশে এসেছিলেন কয়েক বছর আগে। শুনেছি, তিনি নাকি নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর পরিবারের কন্যা হওয়ায় অনেকে অতি আনন্দে তার মাঠপর্যায়ে গবেষণায় সাহায্য করেছেন। অনেকের সাক্ষাৎকার তিনি নিয়েছেন। তারা যুদ্ধের কথা বলেছেন, হত্যার কথা বলেছেন কিন্তু ধর্ষণের কথা বলেননি। তার মানে পাকিস্তানিরা মহিলা ও শিশুদের টার্গেট করেনি। তার ভাষায়, ॰.... ড়িসবহ বিৎব হড়ঃ যধৎসবফ নু ঃযব ধৎসু রহ ঃযবংব বাবহঃং বীপবঢ়ঃ নু পযধহপব ﾒংপয ধং রহ পৎড়ংংভরৎব. এঃযব ঢ়ধঃঃবৎহ ঃযধঃ বসবৎমবফ ভৎড়স ঃযবংব রহপরফবহঃং ধিং ঃযধঃ ঃযব চধশরংঃধহ ধৎসু ঃধৎমবঃবফ ধফঁষঃ সধষবং যিরষব ংঢ়ধৎরহম ড়িসবহ ধহফ পযরষফৎবহ.চ অবশ্য, তিনি এও স্বীকার করেছেন, অন্য স্থানেও কেউ ধর্ষিত হতে পারে, মহিলা ও শিশুদের সৈন্যরা ক্ষতি করতে পারে। বিহারিদের নিশ্চিহ্ন করার ব্যাপারে পাকিস্তানি শ্বেতপত্রে যা বলা হয়েছে তার মাঠপর্যায়ে গবেষণায় তার সত্যতা মিলেছে। পাকিস্তানি সেনা অফিসাররাও তাকে একই কথা বলেছেন। পাকিস্তানি সৈন্যরা কিছু ঘটনা ঘটিয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে শাস্তিও পেয়েছে।

তার মতে, ধর্ষিতা রাবেয়া খাতুনের বয়ান শিক্ষিতের। আখতারুজ্জামান মণ্ডল তার বইতে গণধর্ষণের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা ঠিক নয়। নয়নিকা মুখার্জি এ সংক্রান্ত যেসব গবেষণা করেছেন তাতেও এসব সমস্যা সম্পর্কে লিখেছেন। তবে তার মতামত বাঙালিদের কাছাকাছি। ক্যান্টনমেন্ট ইত্যাদিতে কোনো নারী আটকে [কমফোর্ট উইমেন] রাখা হয়নি। তার ভাষায়– 'এঃযব ধষষবমধঃরড়হ ঃযধঃ ঃযব ধৎসু সধরহঃধরহবফ ওপড়সভড়ৎঃ ড়িসবহ্থ- বাবহ ঃযব হঁসনবৎং বিৎব হড় যবৎব পষড়ংব ঃড় ইধহমষধফবংযর পষধরসং রং ধ ংবৎরড়ঁং পযধৎমব ধহফ সবৎরঃং ভঁৎঃযবৎ রহয়ঁরৎু্থ নীলিমা ইব্রাহিম তার 'আমি বীরাঙ্গনা বলছি'তে যাদের কথা আলোচনা করেছেন তাদের অধিকাংশ বাঙালির দ্বারা ধর্ষিত যাদের পরে মিলিটারিদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। এরা অপহৃত হয়েছেন। পাকিস্তানিরা যদি এদের কিছু না করে থাকে তবুও এদের 'ধর্ষিতা' বলা যায়। ইত্যাদি। শর্মিলা বসুর প্রতিটি লাইনের বিরুদ্ধেই তথ্য প্রমাণসহ প্রতিবাদ করা যায় কিন্তু আমি তা না করে কিছু উদাহরণ দেব মাত্র। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি সৈন্য ও তাদের সহযোগীরা ভারত-বাংলাদেশ যৌথ কমান্ডের কাছে আত্মসমর্পণ করে। তিন দেশের দলিলপত্রে আত্মসমর্পণকারী সৈন্যের সংখ্যা উল্লিখিত হয়েছে ৯০,৩৬৮ জন। শর্মিলা কি বলবেন, তার হিসাবের বাইরে ৬০ হাজার সৈন্য এল কোথা থেকে? রাজাকার, আলবদর, শান্তি কমিটির সদস্য সংখ্যা জানা যায়নি। এদের সংখ্যা ১১ হাজারের বেশি ছিল এবং অধিকাংশ সশস্ত্র। সৈন্যরা দেশ চালায়নি। চালিয়েছে অবরুদ্ধ দেশের এবং পাকিস্তানের সিভিল প্রশাসনের মানুষজন। একটি দেশের সবাই যুদ্ধে যেতে পারে না বা পালাতেও পারে না। এই প্রশাসনের অনেকেই সক্রিয়ভাবে সাহায্য করেছে মুক্তিযোদ্ধাদের। পাকিস্তানি সৈন্যদের সহযোগী জামায়াত, মুসলিম লীগ বা রাজাকার আলবদররা ছিল পাকিস্তানি বাহিনীর সশস্ত্র সহযোগী। হত্যা, লুটপাট, ধর্ষণ সবাই মিলে করেছে। এর অর্থ এ নয় যে, এরা সবাই ধর্ষণ করেছে। একটি সৈন্য একাধিক জায়গায় একাধিকবার ধর্ষণ করেছে। প্রশ্ন, সশস্ত্র ব্যক্তির সংখ্যা যদি দেড় লাখের মতো হয় তাহলে ২ লাখ ধর্ষণ সম্ভব কি-না? রুয়ান্ডাতে ১০০ দিনে আড়াই থেকে পাঁচ লাখ ধর্ষিত হলো কীভাবে? এ সংখ্যা তো পাশ্চাত্যের বিশ্লেষকদের দেওয়া।

পাকিস্তানিরা পরিকল্পিত ধর্ষণ করেছিল কি-না বা যত্রতত্র নারী ধর্ষণে মেতে উঠেছিল কি-না আমি সে সম্পর্কে কিছু তথ্য দেব এবং কোনো বাঙালির তথ্য ব্যবহার করব না, কারণ বাঙালিদের তথ্য শর্মিলা বোসের পছন্দ নয়। উল্লেখ্য, বোস নিজের বিশ্লেষণের জন্য নিয়াজির তথ্য ব্যবহার করেছেন। নিয়াজি একটি মেমোতে লিখেছিলেন, 'আমি চাই সব সৈন্য শৃঙ্খলার প্রতীক হবে।' তারা 'কোড অব অনার মানবে' কারণ তারা 'জেন্টেলম্যান অ্যান্ড অফিসার্স'।

নিয়াজির একটি লেখার উল্লেখ করছি যেখানে তিনি পাকিস্তানি সৈন্যদের ব্যাপক হত্যা, লুট ও ধর্ষণের কথা বলেছেন। তার ভাষায়, 'ঝরহপব সু ধৎৎরাধষ, ও যধাব যবধৎফ হঁসবৎড়ঁং ৎবঢ়ড়ৎঃং ড়ভ ঃৎড়ড়ঢ়ং রহফঁষমরহম রহ ষড়ড়ঃ ধহফ ধৎংড়হ, শরষষরহম ঢ়বড়ঢ়ষব ধঃ ৎধহফড়স ধহফ রিঃযড়ঁঃ ৎবধংড়হ রহ ধৎবধং পষবধৎবফ ড়ভ ঃযব ধহঃর ংঃধঃব বষবসবহঃং; ড়ভ ষধঃব ঃযবৎব যধাব নববহ ৎবঢ়ড়ৎঃং ড়ভ ৎধঢ়ব ধহফ বাবহ ঃযব ডবংঃ চধশরংঃধহরং ধৎব হড়ঃ নবরহম ংঢ়ধৎবফ; ড়হ ১২

অঢ়ৎ. ঃড়ি বিংঃ চধশরংঃধহর ড়িসবহ বিৎব ৎধঢ়বফ ধহফ ধহ ধঃঃবসঢ়ঃ ধিং সধফব ড়হ ঃড়ি ড়ঃযবৎং.’ শুধু তাই নয়, সৈন্যরা ফেরত যাওয়ার সময় লুটের মালও নিয়ে যাচ্ছে এবং এ ক্ষেত্রে পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করছে। তার ভাষায়, ‘ও মধঃযবৎ ঃযধঃ বাবহ ড়ভভরপবৎং যধাব নববহ ংঁঢ়বৎাঃবফ ড়ভ রহফঁষমরহম রহ ঃযরং ংযধসবভঁষ ধপঃরাঃু ধহফ যিধঃ রং ড়িৎংব, ঃযধঃ রহ ংঢ়রঃব ড়ভ ৎবঢ়বধঃবফ রহংঃৎঁপঃরড়হং, পড়সফড়ং, যধাব ংড় ভধৎ ভধরষবফ ঃড় পঁৎন ঃযরং ধষধৎসরহম ঃঃধঃব ড়ভ রহফরংপরঢ়ষরহব. ও ংঁঢ়বপঃ ঃযধঃ পড়ং ধহফ ড়ংপ ঁহরঃং/ংঁন-ঁহরঃং ধৎব ঢ়ৎড়ঃবপঃরহম ধহফ ংযরবষফরহম ংঁপয পৎরসরহধষং.’ সেনাপতি নিজেই তার সৈন্যদের উচ্ছৃঙ্খল ক্রিমিনাল বলেন আর শর্মিলা ইঙ্গিত করেন তারা জেন্টেলম্যান। শর্মিলা বোস, কোন দেশে দক্ষ ও পেশাদার বাহিনী সিভিল সরকারকে ক্ষমতা থেকে হটিয়ে বছরের পর বছর ক্ষমতা দখল করে রাখে? বা নিজের দেশের মানুষকে হত্যা করে, শাস্তি দেয়, লুট করে, ধর্ষণ করে?

পরিকল্পিত ধর্ষণ হয়নি, বলেছেন শর্মিলা। কিন্তু মার্কিন কনসাল জেনারেল আর্চার ব্লাডের ৩১ মার্চের টেলিগ্রাম দেখুন– ‘ঝরী হধশবফ ভবসধষব নড়ফরবং ধঃ জড়শবুধ ঐধষষ উধপপধ ট. ঋববঃ ঃরবফ ঃড়মবঃযবৎ. ইরৎং ড়ভ ৎড়ঢ়ব যধহমরহম ভৎড়স পবরষরহম ভধহং. অঢ়ঢ়ধৎবহঃষু ৎধঢ়বফ, ংযড়ঃ ধহফ যঁহম নু ঃযবরৎ যববষং ভৎড়স ভধহং.’ শর্মিলা যদি ভারত থেকে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকা-বিশেষ করে কলকাতা থেকে পত্র-পত্রিকাগুলো দেখতেন তাহলে এরকম অনেক বর্ণনা পেতেন, অবশ্য কলকাতার পত্রিকাগুলো তো বাঙালিদের। সেগুলো কি বিশ্বাসযোগ্য হবে? পাকিস্তানিদের হলে না হয় কথা ছিল। আচ্ছা পাকিস্তানিদের ভাষায়ই বর্ণনা করি। ওই সময় আলমদার রাজা ছিলেন ঢাকার কমিশনার। তিনি একটি বই লিখেছেন, যাতে পাকিস্তানি সৈন্যদের অহরহ মানুষ ধরে নিয়ে হত্যার বর্ণনা আছে। হামুদুর রহমান কমিশনের বিবরণ প্রকাশিত হলে তিনি এর বিরুদ্ধে একটি রিট করে পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীদের শাস্তি দাবি করেছিলেন। ইসলামাবাদে তিনি এক সাক্ষাৎকারে আমাকে বলেছিলেন, রিটের বয়ানকালে ‘আমি বলছিলাম একটি ঘটনার কথা। চার সৈনিক হামলা করেছে এক বাসায়। বাবাকে মেরে ফেলা হয়েছে। কন্যাটি অল্প বয়সী, যে হাতজোড় করে তাদের জানাল যে, সে মুসলমান। তাকে যেন তারা বোনের মতো দেখে। তারপরও যখন তারা এগিয়ে আসছে তখন সে বলল, আমিও তো পাকিস্তানি। তোমাদের কারো হয়তো আমার মতো মেয়ে আছে। তবুও তারা মানছে না। তখন সে বিছানার পাশে কোরআন শরিফ রেখে বলল, আমার যদি কিছু করতে চাও তাহলে এ কোরআন ডিঙিয়ে করতে হবে। তারা কোরআন ডিঙিয়েছিল। আমি যখন আদালতে এ বর্ণনা দিচ্ছি তখন সারা আদালত স্তব্ধ। আর বিচারক আমাকে জিজ্ঞেস করছেন বারবার, আপনি যা বলছেন তা কি সত্যি? তার চোখে পানি।

কমফোর্ট ইউমেনের কথা বলছেন? যুক্তরাষ্ট্রের টাইম পত্রিকা জানিয়েছিল অক্টোবরে (২৫ অক্টোবর) ক্যান্টনমেন্টে ৫৬৩ জন নারীকে আটকে রাখা হয়েছে। তাদের অনেকে গর্ভবতী। অনেককে গর্ভপাত করানো হয়েছে। কাউকে কাউকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। শর্মিলা অবশ্য এ বর্ণনা পড়লে লিখতেন পাঞ্জাবি সৈন্যরা ‘জেন্টেলম্যান’ দেখেই তো তাদের ছেড়ে দিয়েছে। টাইমের বয়ান–

‘ঙহব ড়ভ ঃযব সড়ংঃ যড়ৎৎরনষব ৎবাবষধঃরড়হং পড়হপবৎহং ৫৬৩ ুড়ঁহম ইবহমধষর ড়িসব, ংড়সব ড়হষু ১৮, যিড় যধাব নববহ যবষফ পধঢ়ঃরাব রহংরফব উধপপধ্থং ফরহমু সরষরঃধৎু পধহঃড়হসবহঃং ংরহপব ঃযব ভরৎংঃ ফধুং ড়ভ ঃযব ভরমযঃরহম. ঝবরুবফ ভৎড়স উধপপধ ঁহরাবৎংরঃু ধহফ ঢ়ৎরাধঃব যড়সবং ধহফ ভড়ৎপবফ রহঃড় সরষরঃধৎু নৎড়ঃযবষং, ঃযব মরৎষং ধৎব ধষষ ঃযৎবব ঃড় ভরাব সড়হঃযং ঢ়ৎবমহধহঃ. এঁযব ধৎসু রং ৎবঢ়ড়ৎঃবফ ঃড় যধাব বহষরংঃবফ ইবহমধষর মুহবপড়ষড়মরংঃং ঃড় ধনড়ৎঃ মরৎষং যবষফ ধঃ সরষরঃধৎু রহংঃধষষধঃরড়হং. ইঁঃ ভড়ৎ ঃযড়ংব ধঃ ঃযব উধপপধ পধহঃড়হসবহঃ রঃ রং ঃড়ড় ষধঃব ভড়ৎ ধনড়ৎঃরড়হং. এঁযব সরষরঃধৎু যধং নবমধহ ভৎববরহম ঃযব মরৎষং ধ ভব িধঃ ধ ঃরসব, ংঃরষষ পধৎৎুরহম ঃযব নধনরবং ড়ভ চধশরংঃধহর ংড়ষফরবৎং.’

সারা পৃথিবীতে টাইমে সংবাদের নির্ভুলতার খ্যাতি বিদ্যমান।

এবার আসুন ধর্ষণের সংখ্যায়। ধর্ষিতাদের সাহায্য করতে তখন অস্ট্রেলিয়া থেকে এসেছিলেন ডা. জিওফ্রে ডেভিস। তিনি তার পর্যবেক্ষণের কথা বলেছিলেন, যা প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৭২ সালে বাংলার বাণীতে।

‘সিডনীর শল্য চিকিৎসক ডা. জিওফ্রে ডেভিস সম্প্রতি লন্ডনে বলেন, ন'মাসে পাক বাহিনীদের দ্বারা ধর্ষিত ৪ লাখ মহিলার বেশির ভাগই সিফিলিস অথবা গনোরিয়া কিংবা উভয় ধরনের রোগের শিকার হয়েছেন। এদের অধিকাংশ ইতিমধ্যেই ভ্রূণ হত্যাজনিত অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন। তিনি বলেন, এরা বন্ধ্যা হয়ে যেতে পারেন কিংবা বাকি জীবন বারবার রোগে ভুগতে পারেন।

ডা. ডেভিস বলেন, বাংলাদেশে কোনো সাহায্য এসে পৌছার আগেই পাকিস্তানি সৈন্যদের ধর্ষণের ফলে ২ লাখ অন্তঃসত্ত্বা মহিলার সংখ্যা গরিষ্ঠাংশ স্থানীয় গ্রামীণ ধাত্রী বা হাতুড়ে ডাক্তারের সাহায্যে গর্ভপাত ঘটিয়েছেন। তিনি বলেন, ক্লিনিক্যাল দিক থেকে গর্ভপাত কর্মসূচি সমাপ্ত হয়েছে; কিন্তু মহিলাদের কঠিন সমস্যা এখানো রয়ে গেছে।

ডা. ডেভিস বলেন, আমরা বিরাজমান সমস্যা সম্পর্কে অবগত হওয়ার আগেই অনিবার্য ও অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির চাপে ২ লাখ ধর্ষিতার মধ্যে দেড় লাখ থেকে ১ লাখ ৭০ হাজার অন্তঃসত্ত্বা মহিলা গর্ভপাত করেছেন।

ধর্ষিত মহিলারা যখন কমপক্ষে ১৮ সপ্তাহের অন্তঃসত্ত্বা তখন ডা. ডেভিস ঢাকা এসে পৌছান।

ধর্ষিতাদের চিকিৎসার জন্য ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকায় একটি ক্লিনিক স্থাপন করা হয়। সরকারি কর্মচারীদের হিসাব মতে, ধর্ষিত মহিলাদের আনুমানিক সংখ্যা ২ লাখ। ডা. ডেভিসের মতে, এ সংখ্যা অনেক কম করে অনুমান করা হয়েছে। তিনি মনে করেন, এর সংখ্যা প্রায় সাড়ে ৪ লাখ হতে পারে। ডা. ডেভিস বলেন, অন্তঃসত্ত্বা মহিলার সংখ্যাই ২ লাখ।

অন্তঃসত্ত্বা মহিলাদের সাহায্য সংক্রান্ত কর্মসূচি শুরু হওয়ার আগেই দেড় লাখ থেকে ১ লাখ ৭০ হাজার মহিলার গর্ভপাত করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৩০ হাজারের মধ্যে কেউ কেউ আত্মহত্যাও করেছেন, কেউ আবার তাদের শিশুদের নিজের কাছে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

ধর্ষিত মহিলাদের যে হিসাব সরকারিভাবে দেওয়া হয়েছে ডা. ডেভিসের মতে তা সঠিক নয়। সরকারি কর্মকর্তারা বাংলাদেশের জেলাওয়ারি হিসাব করেছেন। সারাদেশের ৪৮০টি থানা ২৭০ দিন পাক সেনাদের দখলে ছিল। প্রতিদিন গড়ে ২ জন করে নিখোঁজ মহিলার সংখ্যা অনুসারে লাঞ্ছিত মহিলার সংখ্যা দাঁড়ায় ২ লাখ। এ সংখ্যাকে চূড়ান্তভাবে নির্ভুল অঙ্ক রূপে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

কিন্তু হানাদার বাহিনী গ্রামে হানা দেওয়ার সময় যেসব তরুণীকে ধর্ষণ করেছে তার হিসাবরক্ষণে সরকারি রেকর্ড ব্যর্থ হয়েছে। পৌনঃপুনিক লালসা চরিতার্থ করার জন্য হানাদার বাহিনী অনেক তরুণীকে তাদের শিবিরে নিয়ে যায়। এসব রক্ষিত তরুণীর অন্তঃসত্ত্বার লক্ষণ কিংবা রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিলে হয় তাদের পরিত্যাগ করা হয়েছে, নয়তো হত্যা করা হয়েছে। কোনো কোনো এলাকায় ১২ ও ১৩ বছরের মেয়েদের শাড়ি খুলে নগ্ন করার পর ধর্ষণ করা হয়েছে। যাতে তারা পালিয়ে যেতে বা আত্মহত্যা করতে না পারে।

হতভাগা বন্দি নারীদের যখনই শাড়ি পরতে দেওয়া হয়েছে তখনই তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করেছে। ডা. ডেভিস বলেন, অনেকেই বুকে পাথর বেঁধে পুলের ওপর থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেছেন। যারা প্রাণে বেঁচে গেছেন তেমন ধরনের হাজার হাজার মহিলা তাদের পরিবার কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়েছেন। কারণ তারা ধর্ষিতা, অন্তঃসত্ত্বা। বর্তমানে দেখতে অপরিচ্ছন্ন। এ ধরনের ঘটনা বড়ই মর্মান্তিক।

ডা. ডেভিস বলেন, "চট্টগ্রামে আমি একজন মহিলাকে দেখেছি, তিনি বিধবা। যুদ্ধে তার ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়ে গেছে। তার সন্তান দুটি এবং তিনি ছ'মাসের অন্তঃসত্ত্বা। গর্ভপাত ঘটানোর পর এই মহিলার থাকার মতো স্থান নেই। ছেলেমেয়েদের আহার জোগানের কোনো সংস্থান নেই।"

আরেকজন মহিলার স্বামী যখন যুদ্ধে গেছেন তখন তাকে হানাদাররা ধর্ষণ করে। স্বামী এসে স্ত্রীকে দেখেন গর্ভবতী। তিনি স্ত্রী এবং দুটি সন্তানকে ফেলে চলে যান। এবং এ বলে যান যে, আর তিনি তাদের গ্রহণ করবেন না।

আরেকজন তরুণী বয়স ১৯। অশিক্ষিতা। সে ছিল ছয় মাসের গর্ভবতী। তার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব তাকে ত্যাগ করে চলে যায়। সে স্বল্পকালের জন্য সাহায্য কেন্দ্রে আশ্রয় পেয়েছে। কিন্তু তারপর সে কোথায় যাবে কেউ জানে না।

ধর্ষণের কথা কেউ বলেনি, তাই ধর্ষণ হয়নি এবং উল্লিখিত সংখ্যা অতিরঞ্জিত– এ লজিক খুবই অদ্ভুত। বাঙালি মহিলারা কি সবাই তসলিমা নাসরিন? শর্মিলা কি ধর্ষণ বিষয়টা বোঝেন এবং যুদ্ধকালীন ধর্ষণ। যেহেতু [অনুমান করে নিচ্ছি] তিনি যুদ্ধ দেখেননি তাই যুদ্ধের চরিত্র তিনি অনুধাবন করতে পারবেন না। তিনি কি বাঙালি? বাঙালি হোন না হোন, ধর্ষিত নারী কখনোই

প্রকাশ করতে চান না তিনি ধর্ষিত হয়েছেন, তার পরিবারও। পাশ্চাত্যেও না। পাশ্চাত্যে যত ধর্ষণ হয় তার কয়টি রিপোর্ট করা হয়? আর প্রাচ্য, তারপরও বাংলাদেশ এবং তাও চার দশক আগের বাংলাদেশ, যে সময় নারীরা ঘরের বাইরেই প্রায় যেত না। যারা কখনো যুদ্ধ দেখিনি। সেখানে পুরুষ-নারী কারো বর্ণনায় ধর্ষণের বিষয়টি আসবে না। সেটি কলঙ্ক মনে করা হয় সামাজিকভাবে। যে নীলিমা ইব্রাহিমের বই থেকে তিনি উদ্ধৃতি দিয়েছেন সেই নীলিমা ইব্রাহিমের বইতেও এর ইঙ্গিত আছে। ১৯৭২ সালে পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দিরা যখন বাংলাদেশ ছেড়ে যাচ্ছে তখন খবর পান ৩০/৪০ ধর্ষিত নারীও চলে যাচ্ছে। তিনি তাদের সঙ্গে দেখা করে দেশ ত্যাগ না করার অনুরোধ জানান। এর মধ্যে ১৪/১৫ বছরের এক কিশোরীও ছিল। তিনি তাকে বললেন, 'তুমি আমার বাড়িতে থাকবে মেয়ের মতো' মেয়েটি রাজি হয়নি। বলেছে, 'আপনি যখন থাকবেন না তখন কী হবে? যখন লোকে জানবে পাকিস্তানিরা আমাকে ধর্ষণ করছে তখন সবাই আমাকে ঘৃণা করবে।' নীলিমা ইব্রাহিম বললেন, 'তুমি কি জান পাকিস্তানিরা তোমাকে নিয়ে কী করবে? মেয়েটি বলেছিল, 'জানি, ওরা আমাকে বিক্রি করে দেবে। কিন্তু ওখানে কেউ আমাকে চিনবে না।

মুক্তিযুদ্ধে ধর্ষিতার সংখ্যা দিয়ে কী বোঝানো হয়? বাঙালিরা বলেন, দু'লাখ ধর্ষিত হয়েছে। তাতে পাকিস্তানিদের নিষ্ঠুরতার মাত্রাটা বোঝানো হয়। শর্মিলা বলেন, হয়তো দু'হাজার ধর্ষিত হয়েছে, তাতে যুদ্ধের ব্যাপকতা ও নিষ্ঠুরতা হ্রাস পায়। শর্মিলাদের উদ্দেশ্যও তাই, যার সঙ্গে বিবেকবান পাকিস্তানিরাও একমত নন। বিষয়টিকে অন্যভাবেও বিবেচনা করা যেতে পারে। এই বিবেচনার কথা বলেছিলেন পাকিস্তানের প্রখ্যাত কলামিস্ট এমভি নকভি। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি বর্বরতার প্রতিবাদ করে তিনি 'দ্য ডনে' লিখেছিলেন। 'ডন' তা ছাপেনি দেখে 'ডনে' লেখা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। করাচিতে তার সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম। 'পাকিস্তানি বাহিনী ছিল,' অকম্পিত স্বরে জানালেন নকভি, 'বিশৃঙ্খলা লুটেরা বাহিনী। এরা লুট করেছে, ধর্ষণ থেকে শুরু করে সব রকমের অপরাধ করেছে। এ সেনাবাহিনী কত বোধহীন ছিল তার প্রমাণ জেনারেল টিক্কা খানের মন্তব্য। ঢাকা থেকে ফেরার পর সাংবাদিকরা যখন লুট, ধর্ষণ, হত্যা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন তখন তিনি বলেছিলেন, ধর্ষণের সংখ্যাটি অতিরঞ্জিত [দেখুন, বেলুচিস্তানের কসাই নামে খ্যাত টিক্কার সঙ্গে শর্মিলার মতের মিল কত গভীর]। মাত্র তিন হাজার, মাত্র তিন হাজার মহিলা ধর্ষিত হয়েছে!' তিনি ক্রোধে, আবেগে এরপর আর কথা বলতে পারছিলেন না। উল্লেখ্য, গণহত্যার মাসখানেক পর টিক্কা পাকিস্তানে ফেরেন। সে সময়ই সরকারিভাবে তিনি ৩ হাজার ধর্ষণের কথা বলেছেন। নকভি এরপর যা বলেছিলেন তা হলো, একজনকেও যদি ধর্ষণ করা হয় সেটিও অপরাধ। তিনি যা বলতে চেয়েছিলেন তার গূঢ়ার্থ, রাষ্ট্রের 'রক্ষক' তো ধর্ষণ করতে পারে না। ধর্মীয় বিবেচনা যদি আনেন তাহলে এভাবে বলা যায়– তৎকালীন পাকিস্তানি সরকার ছিল রাষ্ট্রের রক্ষক। তারা তাদের নাগরিকদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। আমানত খেয়ানত করেছিল। ইসলাম ধর্মে আমানত খেয়ানত করার চেয়ে বড় পাপ কমই আছে।

বাঙালি কর্তৃক প্রবলভাবে বিহারি মহিলা ধর্ষণের উল্লেখ করেছেন শর্মিলা। ২৫ মার্চের [১৯৭১] আগে পাকিস্তানিদের হয়ে ঢাকা, চট্টগ্রামসহ আরো কয়েক জায়গায় বিহারিরা দাঙ্গা শুরু করে। এ দাঙ্গায় উভয়পক্ষেই নিহত হয়। কিন্তু ব্যাপকভাবে তা ছড়িয়ে পড়ার আগেই দমিত হয় বাঙালি রাজনীতিবিদদের হস্তক্ষেপে। ২৫ মার্চের পর হানাদারদের সহযোগিতায় বিহারিরা ঝাঁপিয়ে পড়ে বাঙালিদের ওপর। ২৬-৩০ মার্চ বিহারিরা মিরপুরে কী করেছিল তার সাক্ষী আমি নিজে। সৈয়দপুরেও একই কাণ্ড হয়। বাঙালিরা কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রতিরোধ করে। সেখানে নিষ্ঠুরতা, ধর্ষণের দু-একটা ঘটনাও ঘটতে পারে, যা কাম্য ছিল না। কিন্তু তখন যুদ্ধ চলছিল, নিরস্ত্র বাঙালিরা আত্মরক্ষায় ব্যস্ত ছিল। ওই ধরনের ঘটনা যদি ব্যাপক ঘটত তাহলে পাকিস্তানি (দুই অংশের) এমনকি বিদেশি পত্র-পত্রিকায়ও ব্যাপকভাবে তা ছাপা হতো। কিন্তু, বিহারিদের ওপর 'প্রবল' অত্যাচারের খবর পাওয়া যায় একমাত্র পাকিস্তানি 'শ্বেতপত্র' ও মাসকারেনহাসের লেখা প্রতিবেদনের এক অনুচ্ছেদে। মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে বিহারিদের বরং পাকিস্তানিরা ব্যবহার করে প্রচারের উদ্দেশ্যে। আমরা যখন পাকিস্তানি নীতিনির্ধারকদের সঙ্গে আলাপ করি তখন দু-একজন জেনারেল ছাড়া বিহারিদের ওপর 'প্রবল' অত্যাচার ও 'প্রবল ধর্ষণের' কথা কেউ বলেননি। এবং সেসব জেনারেলও মৃদুভাবে তা বলেছেন। ১৯৭১ সালে নকভিকে সাংবাদিক হিসেবে নিয়ে যাওয়া হয়ে ঢাকায়। হানাদারদের উদ্দেশ্য ছিল এটা বোঝানো যে, বিহারিদের ওপর প্রবল অত্যাচার হয়েছে, তাই পাকিস্তানিরা তাদের জানমাল রক্ষায় ব্যস্ত। নকভির ভাষায়, 'আমাদের তথাকথিত একটি রিফিউজি ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, যেখানে রাখা হয়েছিল বিহারিদের (লক্ষ্য করুন, 'তথাকথিত' শব্দটি) একজন পাঠান কর্নেল ছিলেন ক্যাম্পের কমান্ডার। কমান্ডার বললেন, এসব কথা শুনতে শুনতে [বিহারিদের ভাষ্য] যখন আমার রাগ লাগে, ক্লান্ত লাগে তখন গ্রামে গিয়ে কিছু মানুষ মেরে আসি।' চিন্তা করে দেখুন, বললেন নকভি, 'গ্রামের নিরীহ মানুষদের লাইন' ধরিয়ে গুলি করে আসে। এ ধরনের প্রচুর কাহিনী আছে। এরা কি মানুষ, নাকি পশুরও অধম...।' আর বাঙালিরা বাঙালি নারীদের ধর্ষণ করেছে। তাত্ত্বিকভাবে ঠিক। তবে বাস্তব হলো সেই বাঙালিরা ছিল হানাদার বাহিনীর সহযোগী জামায়াতে ইসলামীর ক্যাডার, আলবদর বা রাজাকার। শর্মিলা বসুও যেমন হানাদারদের সাফাই গাইছেন এখন, তেমনি অনেক বাঙালি ছিল পাকিস্তানিদের সহযোগী। বাঙালিরা (মুক্তিযোদ্ধা) পশ্চিম পাকিস্তানি মহিলা ধর্ষণ করেছে এ ঘটনার বয়ান এই প্রথম

শুনলাম। পাকিস্তানিরাও তা উল্লেখ করেনি। কারণ এটি অবাস্তবের অবাস্তব। শর্মিলা নিজেও তো নিয়াজির মেমোর উদ্ধৃতি দিয়েছেন। যেখানে জেনারেল নিজেই লেখেন, পাকিস্তানি সৈন্যরা পশ্চিম পাকিস্তানি মহিলাদের ধর্ষণ করেছে। শর্মিলা অবশ্য বলতে পারেন। সেসব পাকিস্তানি বাঙালি ছিল। পালাতে পারেনি বা স্বেচ্ছায় কিছু বাঙালি সৈন্য/অফিসার ১৯৭১ সালে পুরোটা হানাদার পাকিস্তানিদের সঙ্গে ছিল। এ যুক্তি দিলে অবশ্য আমার কিছু বলার থাকবে না।

সবশেষে একটি কথা বলি, শর্মিলা সব সময় মুক্তিযুদ্ধকে ‘গৃহযুদ্ধ’ বলে উল্লেখ করেছেন। পাকিস্তানি সৈন্যপ্রেমী এই মহিলার জ্ঞাতার্থে বলি, যুক্তরাষ্ট্রের পর বাংলাদেশই বিশ্বের দ্বিতীয় দেশ, যে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে যুদ্ধ করেছিল এবং জয়ী হয়েছিল। তাই তাত্ত্বিকভাবেও এটিকে গৃহযুদ্ধ বলা সমীচীন নয়। এতে একটি রাষ্ট্রীয় জন্মকেই অপমান করা হয়। পাকিস্তানি সৈন্যরা পাকিস্তান শুধু ভাঙেইনি, পাকিস্তানকে ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত করেছে। পাকিস্তানি সিভিল সমাজকে [যাদের অনেকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর গণহত্যা ও ধর্ষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে জেলে পর্যন্ত গিয়েছিলেন] তারা অস্ত্রের সাহায্যে দমন করে রেখেছে, যেখানে বীরত্বের কিছু নেই। নিন্দিত এই সেনাবাহিনী পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করে ভারতকে [তাদের ভাষায় হিন্দুস্থান] এবং হিন্দু সম্প্রদায়কে। বাঙালি মুসলমান সম্প্রদায়কেও তারা ভারতের হিন্দুদের সমার্থক মনে করে। সেই বাহিনীর প্রতি যখন কোনো বাঙালি নারী গবেষণার মোড়কে তাদের অন্যায়কে খাটো করে দেখার চেষ্টা করেন, তখন এটিই অনুধাবন করি– আসলেই আইএসআই খুবই শক্তিশালী, প্রভাবশালী, কর্মক্ষম আইনি সন্ত্রাসী একটি প্রতিষ্ঠান।